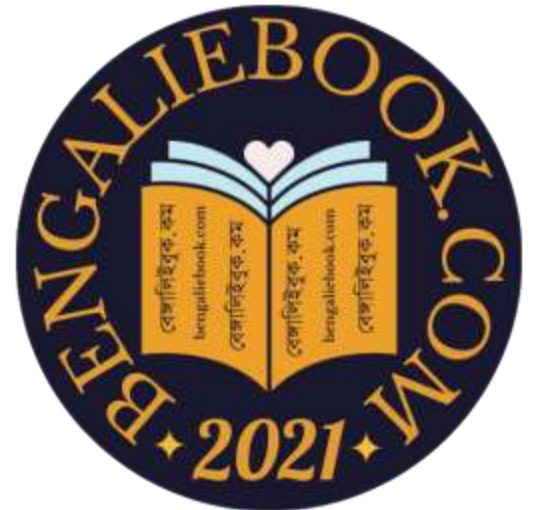


প্রবন্ধ

শব্দগুণা, মিরন্দা এবং

দেবদীমোনা

বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেবুদিমোঁতা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রম্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা শকুন্তলা অম্পরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুঃস্বপ্নের স্মরণ-পথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।

দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady

I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I liked several women;

—————but you, O you,

So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাঁহারা

লোকালয়ে প্রতিপালিতে নহেন | শকুন্তলা বঙ্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী | তাঁহার ভগিনীশ্লেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃশ্লেহ, সহকারের উপর; পুত্রশ্লেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া শকুন্তলা অশ্রুমুখী কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুঃস্বপ্নের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদগত প্রণয় সখীদের সম্মুখে সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেন নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতে পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্য যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O, dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফার্দীনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,
My affections

Are then most humble; I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়স্পর্শশূন্য ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে—এক স্থানে কণ্ঠের তপোবন—অপর স্থানে প্রম্পোরের তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যে রূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইবে। পৃথক পৃথক কবি প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুঃস্বপ্নের কথা দূরে থাক, সখীদ্বয় যত দিন তাহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোহপি নয়নে যৎ প্রেয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইতু্যপরুদ্বয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,

সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি॥

শকুন্তলা দুগ্ধন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বন্ধল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাক্ষুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man that e'er I saw, the first
That e'er I sigh'd for:

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুগ্ধন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ এক প্রকার লুকোচুরি খেলা। “সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?”— “তবে, আমি উঠিয়া যাই”— “আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই”—শকুন্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে লজ্জা করে না; নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

But my modesty,
The Jewel in my dower, I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ:—

Hence, bashful cunning!
And prompt me, plain and holy innocence!
I am your wife, if you will marry me;
If not, I'll die your maid; to be your fellow
You may deny me; but I'll be your servant,

Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা নূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, “আমর দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর”, মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুগ্ধন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবন্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতি সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকোচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা “অন্ধপথে সুমরিঅ এদম্ম হত্খবুংসিগো মিণালবলঅম্ম কদে পড়িণিবুত্তম্মি |” ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুগ্ধন্তের মুখে—

“ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রোণ |” এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, “অসন্তোষে উণ কিং করেদি?”—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুগ্ধন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্তি—অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুগ্ধন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুগ্ধন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্ৰীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরকে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্ৰীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গান্ধীর্ষ্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধু বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,— আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়— “অসন্তোষে উণ কিং করেদি?” তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুগ্ধন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—“অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?”—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুগ্ধন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিণ্ডে পদুমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব, ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুগ্ধন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।

এক্কস্মঅ চরিত্র ভণাদু কিং এক্কএক্কস্মিৎ॥

তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েরই “দুরারোহিণী আশালতা” মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্ৰের যে মোহ, তাহা দেস্দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া-কেন না, দুই নায়িকারই “দুরারোহিণী আশালতা” পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্তৃক বিসর্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচারপরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্ৰাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যালোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্ৰাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী-উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মধু, যে সকল

নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ভাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তোঃ” শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোক অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি-প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্দিমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?” যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন “ভদ্রে! দুশ্মন্তের চরিত্র সবাই জান,” তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গ বলিলেন,

তুম্কে জেব পমাণং জাণধ ধম্মখিদিঞ্চ লোঅসম্ম।

লজ্জাবিগিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।” বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু!” বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন,” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,

What shall I do to win my lord again?

Good friend, go to him; for, by this light of heaven,

I know not how I lost him. Here I kneel:

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে “বধ করিব!” বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।” যখন দেস্দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্তজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মৃত তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কার্য্য কে করিল?” তখনও দেস্দিমোনা বলিলেন, “কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।” তখনও দেস্দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্দিমোনার সঙ্গে তুলনীয় এবং তুলনীয়ও নহে। তুলনীয় নহে—কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপরিমিত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োথিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ ঘেষ ঈর্ষ্যাতি বাতায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত, কোলাহল, বিলোল উর্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক

নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অতুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অতুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলেও হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষুর জল ফোঁটা ফোঁটা গগু বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভুলগুজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুঃখের মুখে না শুনিতে বুঝিতে পারি না—যথা

ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোহতিপুরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্দিমোনার হৃদয় আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।